মেমোরিজ অব আন্ডারডেভেলপমেন্ট : বল প্রয়োগের রাজনীতির ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ

ফারুক ওয়াসিফ

"Let us now apply our theory to contemporary German history and its use of force, its policy of blood and iron. We shall clearly see from this why the policy of blood and iron was bound to be successful for a time and why it was bound to collapse in the end."-Engels 1887

সমঝোতায় সমাজ গঠিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের ভিত্তি বল প্রয়োগ। বল প্রয়োগ মোকাবিলায় পাল্টা বল প্রয়োগ করে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পাল্টা বল প্রয়োগেরই নাম ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ। কিন্তু সেই রাষ্ট্রটি আজ অবধি তার নাগরিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধেই সক্রিয়। শাসক শ্রেণিগুলো নিজেদের দ্বন্দ্ব মীমাংসায় কিংবা রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের হেতুর মধ্যে বল প্রয়োগের বিকল্প কোনো উপাদানের জন্ম দিতে পারেনি। গণতন্ত্র এ কারণেই এ দেশে অসম্ভব প্রকল্প হয়ে আছে। বশীভূত নাগরিক দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চলে না। রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সংবিধান ও আইনের মধ্যস্থতা করার সুযোগ যখন কম, তখন নাগরিকের স্বাধীনতা আর রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়ায় কোনো বাধাও থাকে না। বাংলাদেশে এখন সে রকমটাই ঘটছে।

রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা দাবি করলেও তা করতে হয় জনগণের নামে। জনগণই এখানে সাংবিধানিকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার দাবিদার। রাজতন্ত্রে এই ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে সম্রাট বা রাজার সিংহাসনের ওপর। তিনিই সেখানে একমাত্র সভরেইন, বাদবাকিরা সকলে প্রজা; স্বাধীন নাগরিকের ধারণা সেখানে অকার্যকর। গণতন্ত্রে জনগণ সার্বভৌম হলেও তাদের প্রতিভূ কোনো একক ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠী নয় বলে, বা জনগণ এক বিমূর্ত পদ ও প্রত্যয় বলে সার্বভৌমত্বের সিংহাসনটি শূন্য থাকে। এর ডানে-বামে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি থাকেন, আর তলায় থাকে সংসদ বা জনগণের প্রতিনিধিসভা। তাঁরা মিলেই জনগণের নামে শাসনকাজ চালান। একদিকে জনগণ রাষ্ট্রকাজের কর্তা হিসেবে অনুপস্থিত, অন্যদিকে নির্বাচনে নাগরিক হিসেবে রায় দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রকাজে হাজিরানা দেয়ার মাধ্যমে উপস্থিত–এই দুই অবস্থানের মধ্যে সেতু রচনা করে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধি চয়ন করার এবং শাসক বদলানোর এই সুযোগের কারণেই গণতন্ত্রে কোনো রাষ্ট্রনায়কেরই নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ভাবার সুযোগ থাকে না। গণতন্ত্রে তাই সার্বভৌমত্বের সিংহাসনটি শূন্যই থাকে; কেবল ধারণা হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের উপস্থিতি সেখানে কল্পনা করে নেয়া যায়।[১]

বিগত ৫ জানুয়ারির নির্বাচনী প্রহসনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের অবসান ঘটে যায়। সত্যিকার নির্বাচন ছাড়াই আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার যুক্তি দেয়া হলেও কার্যত এটা হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা। যখন সেই অর্থে প্রতিনিধিত্বকারী সংসদ নেই, যখন নাগরিকের ভোটের অধিকার অস্বীকৃত, তখন কার্যত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের আসনটি আর প্রতীকীভাবে হলেও জনগণের দ্বারা পূরণ হওয়ার সুযোগ থাকে না। জনগণের রাজনৈতিক ইচ্ছা আর ভোটের রায় যখন এভাবে বাতিল হয়ে যায়, তখন সার্বভৌমত্বের শূন্য সিংহাসন আর শূন্য থাকে না। এই শূন্য সার্বভৌমত্ব পূরণ করে তখন অনির্বাচিত ও অগণতান্ত্রিক কোনো শক্তি। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সেই সিংহাসন একাই ভরাট করে আসীন হয়ে যান। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন এই অর্থে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে চরম প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে। শাসনদণ্ড যখন নিজেকে অবৈধ করে ফেলে, তখন বল প্রয়োগই হয়ে দাঁড়ায় তার টিকে থাকার এবং শাসনের সম্মতি আদায়ের হাতিয়ার।

গণতন্ত্রে বল প্রয়োগ প্রচ্ছন্ন থাকে, পর্দার আড়ালে থাকে; সামনে থাকে সমঝোতা। নির্বাচন এরকম এক সমঝোতা, যেখানে বিনা বল প্রয়োগে ক্ষমতার পালাবদল হবে, সরকারের নবায়ন হবে। বল প্রয়োগের একচ্ছত্র দাপটের কারণে বাংলাদেশে এই গণতান্ত্রিক রীতি প্রাধান্যে আসতে পারেনি। এ কারণে চরিত্রগতভাবে বাংলাদেশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে আলাদা নয়। দুই শ' বছর ঔপনিবেশিক দখলদারি করেও ইংরেজ ভারতবাসীদের মনে বিদেশি শাসন বিষয়ে সম্মতি ও সমঝোতা আদায় করতে পারেনি। ব্রিটিশ শাসনের কোনো মান্যতা (হেজিমনি) যখন ছিল না, দেশ শাসন তখন চলে দাপটের (ডমিন্যান্স) ভিত্তিতে।[২]

পাকিস্তান পর্ব পেরিয়ে বাংলাদেশ পর্বেও সেই ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বল প্রয়োগের সর্বব্যাপিতা দিয়ে অটুটই আছে। এই রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণিগুলোর অস্তিত্বের ভিত্তি আজও নির্ভরশীল বল প্রয়োগের ক্ষমতার উপরই। ২০০৬-০৮ এর জরুরি অবস্থার সময় বল প্রয়োগের এই রাষ্ট্রীয় হাত যেমন গণতান্ত্রিক সমঝোতার তোয়াক্কা করেনি, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির আগের ও পরের সরকারি ক্ষমতাও সেইভাবে বল প্রয়োগকে শাসনের প্রধান হাতিয়ার করায় বেপরোয়া। ভোটারবিহীন নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বহীন সংসদ অনিবার্যভাবে জন্ম দিয়েছে একচেটিয়া বল প্রয়োগের ক্ষমতার সরকারের। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়ে মানুষ হত্যা, জনগণের সম্পদের লুণ্ঠন এবং বিরোধী শক্তিকে বিনাশের কাজে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত। এই বল প্রয়োগের রাজনীতির চরিত্র বিচার এবং তা যে সংকটের জন্ম দিয়েছে, তার পরিণতি অনুমান করাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

২.

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস তাঁর ১৮৮৭ সালে লেখা 'The Role of Force in History'[৩]-এ ইতিহাসে বল প্রয়োগের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্যারি কমিউন ছিল জনগণের বল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবস্থা উচ্ছেদের ঐতিহাসিক আদর্শ। আবার বিসমার্কের জার্মানি বা নেপোলিয়নের ফ্রান্স ছিল আধিপত্যবাদী বল প্রয়োগের উদাহরণ। প্রথমটা যদি জলোচ্ছ্বাস হয়, দ্বিতীয়টা হলো কমোডের ফ্লাশের মতো। শাসকশ্রেণির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফল হিসেবে ঘটা ক্যু অথবা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলো হলো এই ফ্লাশের মতো, যা ক্ষমতার শীর্ষ ব্যক্তিদের গায়ের জোরে অপসারণ করে নতুন ক্ষমতার আসন পাতে। বিপরীতে গণ-অভ্যুত্থান হলো জলোচ্ছ্বাসের মতো, যা সবকিছুকে ভাসিয়ে নেয়, যা আলজেরীয় বিপ্লবী তাত্ত্বিক ফ্রানজ

ফ্যানো কথিত উথাল-পাথাল পরিস্থিতি তৈরি করে। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এ ধরনের জনগণের বল প্রয়োগের দেশীয় উদাহরণ, যেখানে পুরনো শাসকদের উচ্ছেদ ঘটে। আর আশির দশকের সামরিক শাসন থেকে শুরু করে ২০০৬-০৮ সালের জরুরি অবস্থা হলো শাসকগোষ্ঠীর বল প্রয়োগের নজির।

তৃতীয় আরেক ধরনের বল প্রয়োগের বিশ্লেষণ এঙ্গেলস করেন; তা হলো সংহতি সৃষ্টিকারী বল প্রয়োগ। আন্দোলনের মাধ্যমে শাহবাগ এ ধরনের ঐক্য সৃষ্টি করে, সেই ঐক্য থেকে সমর্থন নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমাজের উপর থেকে নিচতলা পর্যন্ত তাদের সমর্থকগোষ্ঠীকে সংহত করে নিতে চেয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে কবজায় রেখে এই সংহতি সামনে আনছে বেনেভোলেন্ট ডিক্টেটরশিপ বা সজ্জন স্বৈরাচারের ধারণা। বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দাবির এই চিন্তা আর যা-ই হোক, গণতন্ত্রবিরোধী। এবং এটা এখন সরকারি মহল খোলাখুলি স্বীকারও করে। জরুরি অবস্থার সময় উন্নয়নের স্বার্থে গণতন্ত্রকে স্থগিত রাখা কিংবা অর্থবহ নির্বাচনের চাইতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি বলে দাবিকারী আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকাকে জরুরি মনে করা একই যুক্তির দুই ব্যবহার মাত্র। উন্নয়নের স্বর্গ রচনা কিংবা যুদ্ধাপরাধমুক্ত বাংলাদেশের এই যুক্তিগুলো সরাসরি ওই সজ্জন স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার মতাদর্শিক হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করে। উদ্দেশ্য যা-ই হোক, এর একচ্ছত্র বল প্রয়োগকারী হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্যই এর সত্যিকার পরিচায়ক।

শাসনক্ষমতার একচেটিয়া দখল নিয়ে দুটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর রেষারেষি, শাহবাগ ও শাপলার জমায়েতের মুখোমুখি হওয়া বা মুখোমুখি করানোর মধ্য দিয়ে বল প্রয়োগের প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পটভূমিতে পাল্টাপাল্টি বল প্রয়োগের এই লড়াইয়ের আপাত মীমাংসা ঘটে ৫ জানুয়ারির ভোটারহীন সাজানো নির্বাচন অনুষ্ঠান করায় আওয়ামী লীগের 'সাফল্যে'। ওই নির্বাচন চালিয়ে নেয়া এবং তা ঠেকানোই ছিল দুটি শক্তির বল প্রয়োগের প্রতিযোগিতার সংঘাতবিন্দু। দৃশ্যত, তাতে বিরোধী জোটের পরাজয়ের মাধ্যমে বল প্রয়োগনির্ভর শাসনেরই জয় ঘটে। এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায়ই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর আওয়ামী লীগ কার্যত জার্মান সম্রাট বিসমার্কের মতো মনে করতে থাকেন, 'আই অ্যাম দ্য স্টেট'। 'আমি ও আমরাই রাষ্ট্র' তথা 'আমরা ও আমাদের মামুদের' প্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ পতিত হয় চরম শাসনতান্ত্রিক সংকটে। জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা সংকুচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে জননিরাপত্তাও পড়ে হুমকির মধ্যে। এককথায়, রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে যায় সমাজের বিরুদ্ধে, জাতির বিরুদ্ধে।

৩.

শাহবাগ আন্দোলন যে মুহূর্ত থেকে সরাসরি বিএনপি-জামায়াত জোটের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলো, যখন থেকে শাহবাগের জমায়েতকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রশক্তি বিএনপি-জামায়াতের ওপর চড়াও হলো, সেই মুহূর্তে বিএনপি-জামায়াতের পক্ষ থেকেও পাল্টা বল প্রয়োগের চাল চালা হলো। ঝটিকা মিছিল, পেট্রোলবোমা, পুলিশের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা করে যোগাযোগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার কর্মসূচির উপর ভর করল বিরোধী শক্তি। তাদের এই গণপ্রতিরোধ ও হেফাজতের ঢাকা ঘেরাও সরকারি ক্ষমতার পাল্টা ক্ষমতা হিসেবে দাঁড়াতে চাইলেও অন্তর্গত কারণে তা দানা বাঁধার আগেই পরাজিত হলো। এই পরাজয়ের সমাজ-রাজনৈতিক ব্যকরণ বুঝতে আমরা শরণ নেব ফরাসি মার্ক্সবাদী সমাজ-দার্শনিক আলা বাদিউয়ের।

জনগণের রাজনৈতিক ইচ্ছা আর ভোটের রায় যখন এভাবে বাতিল হয়ে যায়, তখন সার্বভৌমত্বের শূন্য সিংহাসন আর শূন্য থাকে না। এই শূন্য সার্বভৌমত্ব পূরণ করে তখন অনির্বাচিত ও অগণতান্ত্রিক কোনো শক্তি।

আলা বাদিউ তাঁর 'The Rebirth of History: Times of Riots and Uprisings'[৪] বইয়ে তিন ধরনের রায়ট বা গণবিক্ষোভের কথা বলেছেন : ১. ইমিডিয়েট রায়ট, ২. ল্যাটেন্ট রায়ট এবং ৩. হিস্টরিক্যাল রায়ট। আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রথম ও তৃতীয় ধরনের গণবিক্ষোভ। বাংলায় যাদের নাম দিতে পারি : চোরাগোপ্তা প্রতিরোধ বনাম সর্বজনীন সমাবেশ।

ক্ষমতা পরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ার পথ রুদ্ধ হলে বল প্রয়োগ অনিবার্য। এই অনিবার্যতার পথেই ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল, নব্বইয়ের পালাবদলও সম্ভব হয়েছিল। সরকারযন্ত্রকে অকার্যকর করা, রাষ্ট্রের বল প্রয়োগ মোকাবিলা করে টিকে থাকার চূড়ান্ত মুহূর্তে ক্ষমতাকেন্দ্রের বুকের ওপর সমস্ত জমায়েত কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার এই পথই হলো সর্বজনীন সমাবেশ বা হিস্টরিক্যাল রায়টের ধরন। একে সর্বজনের অনুমোদন অর্জন করতে হয়, দৃশ্যত ব্যাপকসংখ্যক মানুষের সমর্থনপুষ্ট হতে হয়। সংখ্যার জোরে একটি জায়গায় দীর্ঘদিন অবস্থান জারি রাখতে হয়। এবং দ্বন্দ্বের চরম মুহূর্তে লাখো মানুষের ঢল নামিয়ে জনতার সার্বভৌম ক্ষমতা জাহির করতে হয়। নব্বইয়ের পর, আঞ্চলিক পর্যায়ে কানসাট (২০০৬) ও ফুলবাড়ীতেও (২০০৬) এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন সরকারকে হার মানতে হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে অসহযোগ আন্দোলনের তুঙ্গে আওয়ামী লীগের জোটও এরকম সর্বজনীন সমাবেশ ঘটিয়ে সে সময়ের বিএনপি সরকারকে বাধ্য করেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন পরিচালনার দাবি মেনে নিতে। সাম্প্রতিক বিশ্বে তাহরির স্কয়ারের বিক্ষোভ ছিল হিস্টরিক্যাল রায়টের তুলনীয় উদাহরণ। শাহবাগ ও শাপলা ছিল দুই রাজনৈতিক শক্তির হিস্টরিক্যাল রায়টের মাহেন্দ্রক্ষণ। শাহবাগ রাষ্ট্রকে দিয়ে বল প্রয়োগ করিয়ে নিতে চেয়েছিল, আর শাপলা ছিল রাষ্ট্রের বিপরীতে বল প্রয়োগের অনুশীলন।

কিন্তু বিএনপি জোটের দ্বারা বহুবিধ কারণে তাদের গণবিক্ষোভকে হিস্টরিক্যাল রায়টে ওঠানো সম্ভব হয়নি। প্রথমত, তাদের দাবিদাওয়াকে তারা (যে কোনো কারণেই হোক) গণ-অসন্তোষে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, একবিংশ শতকের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আধার হিসেবে কাজ করা বড় শহরগুলোতে শক্তি প্রদর্শনে তাদের অক্ষমতা। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এই পপুলার লেজিটিম্যাসির অভাব এবং ক্ষমতার কেন্দ্র রাজধানী ও বিভাগীয় শহরে শক্তি সমাবেশে ঘাটতির জন্যই তাদের বল প্রয়োগ পরাস্ত হয়। তাই দেখি শাহবাগের প্রতিক্রিয়ায় হেফাজতের মহাসমাবেশ ক্ষণস্থায়ী হয় আর জামায়াতের প্রতিরোধ আটকে থাকে

ইমিডিয়েট রায়ট তথা চোরাগোপ্তা হামলার পথে।

রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হুমকির মুখে ঝটিকা মিছিল, হঠাৎ করে ১০-১২ জন মিলে গাড়ি পোড়ানো, ককটেল ফাটানো হচ্ছে ইমিডিয়েট রায়টের লক্ষণ। মুখ্যত তরুণরাই এর বাহন। ইমিডিয়েট রায়ট অতি অবশ্যই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; যেমন–সীতাকুণ্ড বা সাতক্ষীরা বা বগুড়া। বাদিউ বলেন, "An immediate riot is unrest among a section of the population, nearly always in the wake of a violent episode of state coercion." অর্থাৎ তাৎক্ষণিক স্থানিক বিক্ষোভ প্রায় সর্বদাই রাষ্ট্রীয় সহিংসতার কোনো পর্বের প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয়। দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে যুদ্ধাপরাধের বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রদান এবং দেশব্যাপী তাদের কার্যক্রম দমনকে জামায়াতের সমর্থকদের কাছে মনে হয়েছে সে রকম এক রাষ্ট্রীয় বল প্রয়োগ। এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের কর্মীরা ফেটে পড়ে। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা হলো, নিজ নিজ ঘাঁটি এলাকার মধ্যেই এর শক্তি আবর্তিত হয়ে ফুরিয়ে যায়। এটা সরকারযন্ত্রকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারলেও পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয়। জনগণ ও সরকারের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারলেও এ ধরনের বল প্রয়োগ সরকারের পতন ঘটাতে পারে না। তবে ইমিডিয়েট রায়টও ঘটনার ধারাবাহিকতায় হিস্টরিক্যাল রায়টে উন্নীত হতে পারে; যেমনটা ঘটেছিল তিউনিসিয়ার বেলায়। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত কি সেটা পারবে? পারা সম্ভব ছিল, যদি তারা তাদের বিক্ষোভের প্রতি জনগণের একাংশের সমর্থনকে অধিকাংশের নৈতিক সমর্থনে পরিণত করতে পারত। আর সেটা করতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দলীয় ইস্যুকে সর্বজনের ইস্যুতে পরিণত করতে হতো। জনগণের সামনে উত্থাপিত অনেক ইস্যুর কোনটি তারা নেবে, কোনটির সাথে তারা তাদের যাপিত জীবনের সংকটের যোগাযোগ দেখতে পাবে, তা নির্ভর করে সেই ইস্যুটা বিশেষ থেকে কতটা নির্বিশেষ হতে পারে, অর্থাৎ তার হেজিমনি কতটা প্রতিষ্ঠা হয় তার ওপর।

সেটা যেহেতু তারা পারছে না, সেহেতু প্রশ্ন হলো, চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য তাহলে কী? সরকারের বল প্রয়োগের সমান ও বিপরীত বল প্রয়োগের চাহিদা সৃষ্টি করা? অর্থাৎ তারা নিজেরা যা পারছে না, সেই সর্বাত্মক বল প্রয়োগের অ্যাকশন অন্য কাউকে দিয়ে ঘটানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা! তৃতীয় কোনো পক্ষকে ডেকে আনা? রাজনৈতিক সংকটের রাজনৈতিক মীমাংসায় ব্যর্থ হয়ে সামরিক মীমাংসার পথে পা বাড়ানো? তার জন্য রাজনৈতিক সমস্যাকে সামরিক সমস্যায় পরিণত করা?

ইতোমধ্যে একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাড়াবাড়ি থেকে নিস্তার পাওয়ার ইচ্ছায় অনেকের মধ্যে সামরিক (হস্তক্ষেপে) বল প্রয়োগের দাবি তৈরি হতে পারে। অথবা সে রকম পরিস্থিতি পরিকল্পিতভাবে তৈরি করার চেষ্টাও জারি থাকতে পারে। এভাবে সামরিক বল প্রয়োগ সর্বজনীন সমাবেশ ঘটানোর ব্যর্থতার বিকল্প হয়ে ওঠে অনেকের কাছে। এই বিকল্প সরকার, বিরোধী দল এবং জনগণ–তিন দিকের আকাঙ্ক্ষাতেই প্রবেশ করেছে। এখানেই এঙ্গেলস কথিত বল প্রয়োগের মাধ্যমে সংহতি সৃষ্টির (নেপোলিয়ন বা বিসমার্কের মডেল) তরিকা দেখতে পাব। যদিও এটা এক কৃত্রিম ও ঠুনকো সংহতি, কিন্তু রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকতা বজায় রাখার স্বার্থে সেনাবাহিনী নিজেই রাষ্ট্র হয়ে ওঠার এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। তবে এর মুখোশ কী হবে, সেটা ঘটনাবলির উপর নির্ভর করবে। বাংলাদেশের পুঁজিপতি মহল এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রহরীদের সামনে এটাই তৃতীয় বিকল্প, যার হাতমখশো ২০০৬-০৮ এ এক দফা করা হয়ে গিয়েছে।

আমাদের রাষ্ট্র এসেছে ঔপনিবেশিক শাসনের ধারাবাহিকতা থেকে, পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস বা রূপান্তর না করে। রাষ্ট্র তাই সমাজব্যবস্থা বিকাশের দ্বান্দ্বিক পরিণতিতে অথবা উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ বা আদর্শিক প্রয়োজন থেকে গঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়ায়নি। যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার আমরা বহন করি, তা গঠন করেছিল ইংরেজ বণিকের হাতে গড়া অভিজাত আমলাতন্ত্র ও সেনানায়করা। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরেই সেই রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক শাসকদের হত্যা বা পরাস্ত করে (মুজিব ও ভুট্টোর উদাহরণ স্মরণীয়) নিজেরাই রাষ্ট্রের ভেতর গভীর রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল।

৪.

সেনাবাহিনীর রাষ্ট্র হয়ে ওঠার নজির অবিকশিত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সবখানেই সুলভ। বিবিধ ঐতিহাসিক কারণে ক্ষমতাবান শ্রেণিগুলোর প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ভূত বনেদি বন্দোবস্ত (এলিট সেটলমেন্ট) হিসেবে আসেনি উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রগুলো, যেমনটা ঘটেছিল ক্রমওয়েল যুগের ব্রিটেনে। রাষ্ট্র এখানে ক্ষমতাকামী শ্রেণিগুলোর শ্রেণিসংগ্রামের ফলেও গড়ে ওঠেনি, যেমনটা ঘটেছিল আঠারো-উনিশ শতকের ফ্রান্সে। জনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে জাতীয়তাবাদী কায়দায়ও তা আসেনি, যেমন গামাল আবদেল নাসেরের মিসর বা কাস্ত্রোর কিউবা। বা আসেনি শ্রেণিসমন্বয়ের তাগিদ থেকে, প্রাচীন মিসরীয় রাষ্ট্রে সেচের প্রয়োজনে যেমন শ্রেণিসমন্বয় জরুরি হয়ে উঠেছিল। আমাদের রাষ্ট্র এসেছে ঔপনিবেশিক শাসনের ধারাবাহিকতা থেকে, পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস বা রূপান্তর না করে। রাষ্ট্র তাই সমাজব্যবস্থা বিকাশের দ্বান্দ্বিক পরিণতিতে অথবা উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ বা আদর্শিক প্রয়োজন থেকে গঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়ায়নি। যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার আমরা বহন করি, তা গঠন করেছিল ইংরেজ বণিকের হাতে গড়া অভিজাত আমলাতন্ত্র ও সেনানায়করা। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরেই সেই রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক শাসকদের হত্যা বা পরাস্ত করে (মুজিব ও ভুট্টোর উদাহরণ স্মরণীয়) নিজেরাই রাষ্ট্রের ভেতর গভীর রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল। এরই জের ধরে বাংলাদেশ রাষ্ট্র একই সাথে শাসকশ্রেণির অন্তর্গত এবং ঊর্ধ্বের প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা দেয়।[৫]

জাতিরাষ্ট্রের সংগ্রামে তাই ১৯৭১ সালে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু তা দাঁড়ায় জাতিরই বিরুদ্ধে। পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র এই জাতিবিরুদ্ধ শাসনযন্ত্র চালিয়েছিল[৬], তা বাংলাদেশ আমলেও অবিকলই থেকে গেছে। জনগণের সংগ্রামও একে বিকল করার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। একে বলা যায় উপর থেকে নাজিল হওয়া রাষ্ট্র। অনেক সময় ক্ষমতার পিরামিডের উপরে অবস্থানকারী সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্র এ ধরনের রাষ্ট্রের রক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়।

ঔপনিবেশিক পদ্ধতির জের ধরে শাসকশ্রেণি-ঊর্ধ্ব ও জাতিবিরুদ্ধ রাষ্ট্রযন্ত্রের সংকট ও সুবিধা এখানেই যে, কোনোভাবে এই যন্ত্রটিকে কবজা করতে পারলেই একচেটিয়া শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করা যায়। আন্তর্জাতিক ডিসিপ্লিনিং এজেন্সি তথা জাতিসংঘ-বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি এবং আন্তর্জাতিক পরাশক্তিসমূহ সেনা ও আমলাতান্ত্রিক এস্টাবলিশমেন্টকে ছলে বা বলে বশে আনতে পারলেই তাই জাতিরাষ্ট্রের কেল্লা ফতে হয়ে যায়। বতর্মান মিসর ও জরুরি অবস্থাকালীন বাংলাদেশ এর নিকটতর উদাহরণ। এ ধরনের রাষ্ট্রযন্ত্রও বৈষয়িক স্বার্থে কায়েমি শক্তির বর্ধিত হস্ত হতে দ্বিধা করে না। আশির দশক থেকে কাঠামোগত সংস্কার, নব্বইয়ের দশকের বিশ্বায়ন এবং নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে উন্নয়ন ও সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের আয়োজনের অংশ হয়ে এই রাষ্ট্রযন্ত্র এমনভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে, যাতে এনজিও-সুশীল, সামরিক-এলিট, কর্পোরেট-বিজনেস সিন্ডিকেটগুলো খুব সহজেই এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সাথে প্লাগড-ইন হয়ে যেতে পারে। তৃতীয় দুনিয়ার সেনাবাহিনীগুলো সবচেয়ে সংগঠিত, বিশ্বায়িত ও বিদেশি সাহায্যনির্ভর প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এই কাজে যেমন তারা বেশি উপযুক্ত, তেমনি এটা তাদের জনবিচ্ছিন্নতার অনিবার্য পরিণতিও বটে। আখেরে সেটাই তাদের শ্রেণিস্বার্থ ও বিশেষাধিকার রক্ষার কবচের কাজ করে। মিসর ও পাকিস্তানে এভাবেই সেনাবাহিনীই রাষ্ট্র হয়ে উঠে দেশবিরোধী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এভাবে তাদের দ্বারাই বল প্রয়োগনির্ভর রাজনৈতিক ব্যবস্থা বারে বারে জয়ী হয়।

৫.

ক্ষমতালিপ্সু শ্রেণিগুলোর মীমাংসার অতীত সংকটে সেনাবাহিনী নেয় মাতব্বরের ভূমিকা। সে কারণেই গত জরুরি অবস্থার সময় অধিপতি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সিভিকো-মিলিটারি-কর্পোরেট শক্তিকে রাষ্ট্রীয় ডিসিপ্লিনিং কর্মসূচি পালন করতে দেখি। এককথায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার তলার দিকের অর্গানিক অংশভাগী হিসেবে আমাদের রাষ্ট্রটি জনগণের বিরুদ্ধে তো বটেই, এমনকি খোদ রুলিং এলিটদের বিরুদ্ধেই অভিযানে নেমে পড়তে পারে এই সমাজবহির্ভূত শ্রেণি-ঊর্ধ্ব অবস্থানের সুবাদে। এই চরিত্র ঠিকমতো উপলব্ধির ব্যর্থতা থেকে জনগণের একাংশের মধ্যে ধারণা জন্মে : সিভিকো-মিলিটারি-কর্পোরেট ত্রিভুজ বোধ হয় গডফাদার, দুর্নীতিবাজ ও দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযানে নেমেছে। বুর্জোয়াদের তাড়া খাওয়ার দৃশ্য যাদের মনে 'বিপ্লবী বা সুশীল' সুখানুভূতি দেয়, তারা এখানেই ভুল করে বসেন। কেননা তাঁরা এখনো ওই সজ্জন স্বৈরাচারের ধারণার বশীভূত বলেই সেনাশাসনকে দেখছেন বেনেভোলেন্ট ডিক্টেটরের আদলে। বতর্মানে ক্ষমতাসীন অরাজনৈতিক সরকার সেই কঠিন শাসনেরই খোয়াবি। সেই স্মৃতির বশেই তাঁরা শক্তিমত্ত রাষ্ট্রনায়কের জন্য

ইতিহাসের ধাঁধা হচ্ছে, ভবিষ্যতে এ রকম কোনো চূড়ান্ত বল প্রয়োগ ঘটলে তার মতাদর্শিক মোড়কটা কী হবে? সাম্প্রতিক ঘটনাবলির সমীকরণ অনুসারে অনুমান করা যায়, এবার হয়তো দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতাকে ঢাল করা হবে। সঙ্গে অতি অবশ্যই জঙ্গিবাদবিরোধী মাল-মসলাও পরিবেশিত হবে।

তিতিক্ষা করেন। যাঁরা মার্কিন-ভারতের মদদপুষ্ট কারজাই ধরনের সরকারের আশঙ্কা করছিলেন, আর যাঁরা অপেক্ষা করছিলেন একজন দাপুটে শাসকের। শেখ হাসিনা সরকারের মধ্যে কারজাইয়ের মতো পরনির্ভরশীল এবং জেনারেল সিসির মতো দাপুটে শাসকের আবির্ভাব যে ঘটে গেছে, সেটা বুঝতে এখন আর বিলম্ব হওয়ার কারণ নেই।

৬.

সুতরাং শাহবাগ ও শাপলাকে গ্রাস করার মাধ্যমে সর্বজনীন সমাবেশ বা হিস্টরিক্যাল রায়টকে ভেতর থেকে নিস্তেজ করার রাষ্ট্রীয় খেলায় যখন আর কোনো প্রতিপক্ষ রইল না, তখন রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নিজেরাই হয়ে উঠছে নিজেদের প্রতিপক্ষ। সম্প্রতি শেখ হাসিনা উক্তি করেছেন : আওয়ামী লীগে তিনি ছাড়া আর সকলেই ক্রয়যোগ্য। এই ইঙ্গিত আওয়ামী লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংহতিতে চিড় ধরার খবর দেয়। আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী সেক্টর কমান্ডার এ কে খন্দকারের সদ্য প্রকাশিত বই ঘিরে শাসকদলের হৈচৈ থেকেও অভ্যন্তরীণ বিবাদটা আরো খোলা হয়ে পড়ে। হত্যার চক্র, লুণ্ঠনের চক্র, সাংসদদের মাফিয়াচক্র মিলে যে নৈরাজ্যের মধ্যে বাংলাদেশ পতিত হয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে তার মীমাংসার কোনো সুযোগ আপাতত খোলা নেই। কিংবা দৃশ্যত নিরুত্তেজিত প্রক্রিয়ায় যদি ক্ষমতার হস্তান্তরসহ শাসনতান্ত্রিক সংকটের মীমাংসা হয়ও, তা হবে পর্দার আড়ালে বল প্রয়োগের হুমকির মুখেই।

ইতিহাসের ধাঁধা হচ্ছে, ভবিষ্যতে এ রকম কোনো চূড়ান্ত বল প্রয়োগ ঘটলে তার মতাদর্শিক মোড়কটা কী হবে? সাম্প্রতিক ঘটনাবলির সমীকরণ অনুসারে অনুমান করা যায়, এবার হয়তো দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতাকে ঢাল করা হবে। সঙ্গে অতি অবশ্যই জঙ্গিবাদবিরোধী মাল-মসলাও পরিবেশিত হবে। ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্য তছনছকারী মার্কিন-সৌদি-ইসরায়েলি মদদপুষ্ট ভাড়াটে যুদ্ধবাজ আইএস নিয়ে উপমহাদেশে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং আল জাওয়াহিরির নামে প্রচারিত ভিডিও বার্তায় আল-কায়েদার বাংলাদেশে আগমনের হুমকি যথেষ্টই প্রচারিত হয়েছে। অর্থাৎ গতবারের মতোই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার মিশেল ঘটাবে। জাতিসংঘ সমর্থিত সেনা হস্তক্ষেপের শান্তি মিশন হয়তো এবার দেশীয় ঠিকানা খুঁজবে। বিপ্লবীদের দিক থেকে লুটেরা-খুনি-প্রতারকদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদের অসামর্থ্য, জনগণের নিরাপত্তা দিতে সামর্থ্যবান প্রশাসনিক বল প্রয়োগের শূন্যতা এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি জোটের সমান ও বিপরীত বল প্রয়োগের ঘাটতি–এই তিনে মিলে রাজনীতির বাইরে থেকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে সংকট মীমাংসার চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, তা কিভাবে পূরণ হয় সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা। কিন্তু এটা বোঝার জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন নেই যে, এই মীমাংসা সাময়িক। যেমন ছিল নব্বই, ছিয়ানব্বই ও ২০০৭ এর ১/১১ এর মীমাংসা। সাময়িক জোড়াতালির মীমাংসা সংকটের গভীরতাকেই আরো বাড়ায়, এবং ক্রমশ নিয়ে যায় চূড়ান্ত সংঘাতের দিকে। গণবিরোধী সিভিল-মিলিটারি-কর্পোরেট ব্যবস্থার সাথে জনস্বার্থের বিরোধের সেই মীমাংসাও গণতান্ত্রিক বল প্রয়োগ তথা এক সর্বব্যাপী হিস্টরিক্যাল রায়ট ছাড়া মিটবার

কথা নয়।[৭]

এই বিচারে হয়তো আমরা বাংলাদেশের গত ৪৩ বছরের প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপের উপর দাঁড়ানো একচেটিয়াতন্ত্রের শেষ দশায় উপনীত হচ্ছি[৮]। কিন্তু এর গতিসূত্রটি এখনো রাজনৈতিক সমাজের পরিবর্তনকামী (বিপ্লবকামী) অংশের কল্পনায় ধরা না পড়ায় পরিবর্তনের হাওয়া তাদের মাথার উপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে জনসমতলে তৈরি হচ্ছে জনগণের বল প্রয়োগের তথা নতুন হিস্টরিক্যাল রায়টের প্রয়োজনীয়তা। বাংলাদেশে যে কোনো পরিবর্তনবাদী রাজনীতির ভবিষ্যৎ এই হিস্টরিক্যাল রায়টের ব্যকরণ পাঠ করার ওপরই নির্ভরশীল। এর বাইরে যত নতুনই আসুক, তা অবিকাশের নতুন নতুন গাড্ডা মাত্র।

এই অবিকাশের মধ্যে আমলের পর আমল পার করার ঐতিহাসিক স্মৃতি সামরিক সরকার ও রাজনৈতিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়; একের চাইতে অন্যকে শ্রেয়তর বলে ভাবায়। পার্থক্য অবশ্যই দৃশ্যমান। কিন্তু যা অদৃশ্য তা হলো রাজনৈতিক সরকারের মধ্যেও ডিপ স্টেটের সক্রিয় উপস্থিতি আবার ডিপ স্টেটের সাথে দৃশ্যমান শাসকশ্রেণির বিভিন্ন সিন্ডিকেটের অচ্ছেদ্য আঁতাত। সেই ডিপ স্টেট যখন সামরিক পোশাকে ভেসে ওঠে, তখন তাকে আনকোরা মনে হওয়ার রহস্য হলো, যাবতীয় ময়লা-কালিমার দায় রাজনৈতিক সরকারের ওপর অর্পণ। জনপ্রিয় চিন্তার এই দ্বিধা নিওলিবারেল রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে খুব যায়। কিন্তু তারা ভুলে যায়, সামরিক বল প্রয়োগের হস্তক্ষেপ আসলে ইমিডিয়েট রায়টের হিস্টরিক্যাল রায়ট হয়ে ওঠার গর্ভপাতের মুহূর্ত। আমাদের প্রেক্ষাপটে দুই দলের যে-ই বিরোধী দলে থাকুক, তারাই যে কোনো সত্যিকার জনপ্রিয় প্রতিবাদী আন্দোলন বিকাশের পথে যেমন বাধা, তেমনি তাদের কারণে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার উত্থানও বার বার বেহাত হয়। নিকট সময়ে লীগের দ্বারা শাহবাগের উত্থান আর বিএনপির দ্বারা একদলীয় শাসন কায়েমের বিরুদ্ধে জনমানুষের ক্ষোভ এভাবেই সামরিক বাহিনীর মুখাপেক্ষিতার অসহায়ত্বে শেষ হয়। এই অসহায়ত্ব কেবল জনগণেরই নয়, শাসকশ্রেণির সকল অংশেরও। এক দল ক্ষমতা ধরে রাখতে ব্যর্থ, অন্য দল ক্ষমতা কায়েমে অযোগ্য, 'তৃতীয় শক্তি' নিজেদের স্থায়ী করায় অযোগ্য। লেনিনের ভাষায়, যখন শাসকরা আর আগের মতো করে শাসন করতে পারে না, এবং যখন শাসিতরা আর আগের কায়দায় শাসিত হতে নারাজ; এটাই আদর্শ বিপ্লবী পরিস্থিতি। কিন্তু জনগণ যখন বিপ্লবমুখী নয়, যখন বিপ্লবী শক্তি গঠিত নয়, যখন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এখনো গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ, ইসলাম, আইনের শাসন, সুশাসন ও মানবতার বুলিগুলোর ভণ্ডামি যথেষ্ট মাত্রায় উন্মোচিত নয়, যখন এই ধারণাগুলোর সত্যিকার অর্থ উদ্ধারের উপযোগী নতুন ভাষা চেতনায় সাঁতার কাটছে না, তখন পরিবর্তনের নামে কায়েমি ব্যবস্থার পুনরাবর্তনই বিকল্পহীনতার বিকল্প হিসেবে হাজির হয়। অবিকাশের স্মৃতিভারাক্রান্ত জাতি নিজেকেই তখন আরো ভারাক্রান্ত করে। এ রকম দিনে অবিকশিত রাজনৈতিক চেতনা অপেক্ষা করে শাসকশ্রেণির ঊর্ধ্বের এক বলশালী হস্তের। আর সেই ইঙ্গিতে একজন জেনারেল ইতিহাসের গোলকধাঁধায় আরো কিছুকাল ঘুরপাক খাওয়ানোর মধ্যেই বীরত্বের প্রলোভন পান।

ফারুক ওয়াসিফ: লেখক ও সাংবাদিক
ইমেইল: bagharu@gmail.com

তথ্যসূত্র :

১. Claude Lefort: Democracy and Political Theory, 1991
http://www.scribd.com/doc/37180416/Lefort-Democracy-and-Political-Theory

২. Ranajit Guha: Dominance without Hegemony, Harvard University Press, 1998

৩. Frederick Engels: The Role of Force in History, Works of Frederick Engels 1887
http://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1887/role-force/index.htm

৪. Alain Badiou: The Rebirth of History: Times of Riots and Uprisings
http://kasamaproject.org/revolutionary-strategy/4080-12badiou-the-rebirth-of-history-times-of-riots-and-uprisings

৫. Bryan S. Turner: Marx and The End of Orientalism,
http://www.amazon.com/Marx-End-Orientalism-Controversies-sociology/dp/0043210201

৬. Ahmed Kamal: State Against The Nation: The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54

৭. ফারুক ওয়াসিফ : জরুরি অবস্থার আমলনামা
http://rokomari.com/book/34449;jsessionid=548CCE63FCAD912FC864F622D51CCD45

৮. Khan, Mushtaq H.: Patron-Client Networks and the Economic Effects of Corruption in Asia, June 1998, European Journal of Development Research; Jun 98, Vol. 10 Issue 1, p15